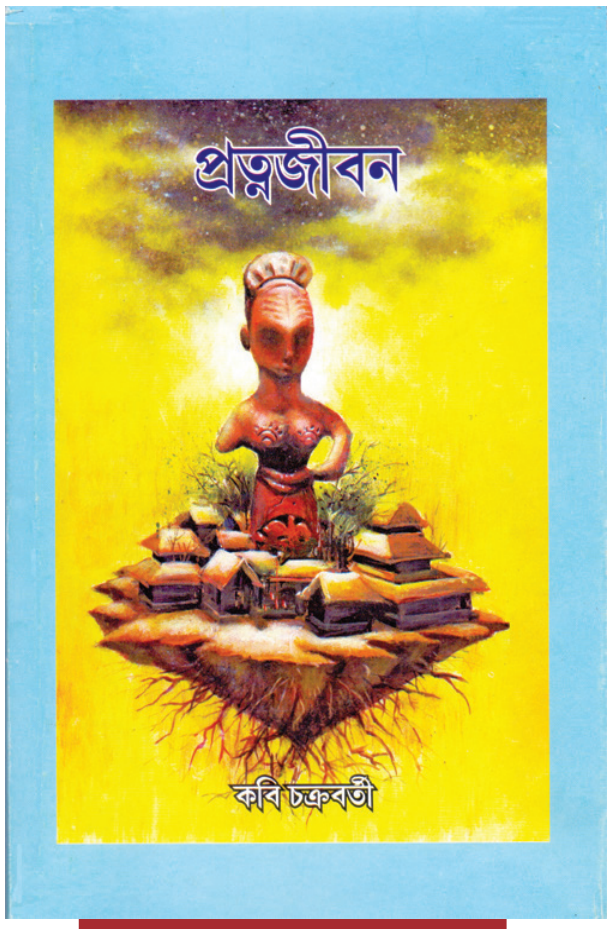

অংশুমান চক্রবর্তী

বই তরণী

কাব্যিক গদ্যে নদীভেজা জনজীবন

কবি। সাহিত্যিক। অনেক সময় দুজন সম্পূর্ণ পৃথক। আবার অনেক সময় একজনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে দুই সত্তা। অনেক কবিই বিভিন্ন সময় পিঁড়ে পেতে বসেছেন গদ্যের পাড়ায়। উপহার দিয়েছেন উৎকৃষ্ট সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, কবি-ঔপন্যাসিক হিসাবে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবি জয় গোস্বামীর উপন্যাসের সংখ্যাও তো কম নয়। আরও কাছাকাছি সময়ে, দুই কবি, বিনায়ক, শ্রীজাতও গুছিয়ে উপন্যাস লিখছেন। অনেকেই বলেন, কবিদের গদ্য কবিতার মতোই। সেখানো ছড়ানো ছেটানো থাকে কবিতার নানা উপকরণ।

সাহিত্যিকরা কবিতা লিখেছেন, এমন উদাহরণও অবশ্য কম নেই। এটাও তো ঠিক, সাহিত্যিকদের কবিতার ঘরে যেতে হবে এমন দিব্যি কেউ দেয়নি। জীবনে সেই অর্থে কবিতা লেখেননি, এমন অনেক সাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাসে ভুরি ভুরি কবিতার উপাদান পাওয়া যায়। বঙ্কিম, শরৎ, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতির গদ্য কি কবিতার তুলনায় কম কাব্যিক?ঝরঝরে গদ্যের মধ্যেও তাঁরা অনেক সময় অজান্তেই বুনে দিয়েছেন টুকরো টুকরো কবিতার অংশ। যা রীতিমতো ভাবায় পাঠক-মনকে। যা প্রচলিত কবিতার থেকেও অনেক অনেক বেশি কবিতা!

কবি চক্রবর্তীর 'প্রত্নজীবন' পড়তে পড়তে মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল কথাগুলো। হারিয়ে যাওয়া এক জনজীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। যা একসময় ছিল, আজ নেই। নেই, তবে লোকমুখে আজও ছড়িয়ে রয়েছে সেইসব মানুষদের কথা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই ধারা বয়ে বেড়ায়।

শুধু মানুষ নয়, প্রাকৃতিক উপাদানও অনেক সময় সাহিত্যের চরিত্র হয়ে ওঠে। বহু ধ্রুপদী উপন্যাস এগিয়েছে নদীকে কেন্দ্র করে। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র মতো বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বাংলা সাহিত্যে।

'প্রত্নজীবন' উপন্যাসে আমরা পেলাম উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের আত্রাই নদী তীরবর্তী অঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা। তাদের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন কাহিনিকার। এই নদী তাদের বড় আপনার। সুখে সুখী, দুখে দুখী। আনন্দে সে খলবল করে ওঠে, শোকে উন্মাদ! সেই নদী অফুরান স্নেহ দিয়ে আগলে রাখে মানুষগুলোকে। আর, কী করে ভুলি, মানুষও বহুকাল ধরেই নদীকে মাতৃরূপে পুজো করে এসেছে।

বহু চরিত্রের আনাগোনা দেখা যায় উপন্যাসটিতে। কোথাও আলো আছে, কোথাও গাঢ় অন্ধকার। অতি মহৎ যিনি, তিনিও কখনও কখনও হয়ে ওঠেন রক্তমাংসের মানুষ। প্রকৃত সাহিত্যের সার্থকতা এখানেই। সে মাটির কাছাকাছি থাকে। যেমনটা থেকেছেন কবি, এই কাহিনির লেখক।

শুরুতে কবিতার কথা বলছিলাম। এই উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে বহু কবিতার উপাদান। খোলা চোখে যাকে দেখা যায় না। আশ্রয় নিতে হয় তৃতীয় নয়নের। বোধের চরম সীমায় পৌঁছে ছুঁয়ে দেখতে হয় সেইগুলিকে। টুকরো টুকরো কবিতা। কখনও বর্ণনায়, কখনও সাধারণের সংলাপে। আশেপাশের কেউ কেউ মামুলি কথার মধ্যে অনেক সময় এমন কিছু অসাধারণ উচ্চারণ করে ফেলেন, যা আদপে কবিতাই। এখানেও ঘটেছে তেমনটাই। অবচেতন মনেই হয়তো কথাকার চুপচাপ গুটিশুটি আশ্রয় নিয়েছেন কবিতাবৃক্ষের নরম শীতল ছায়ায়। আছে গান, একতারা প্রসঙ্গও। সব মিলিয়ে এই উপন্যাস অবশ্যই কাব্যিক।

সংলাপের দিকে ঝুঁকেছেন লেখক। পাশাপাশি আছে অসাধারণ কিছু বর্ণনা। গল্পটির মধ্যেও আছে মারাত্মক এক টান। যা পাঠককে শুরু থেকে শেষে টেনে নিয়ে যায়। অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ে গল্পটি কোনওভাবেই খেই হারিয়ে ফেলেনি। এখানেই লেখকের মুনশিয়ানা। দীর্ঘ উপন্যাস টেনে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। সেই কঠিন কাজটিই তিনি করেছেন। করে দেখিয়েছেন সার্থক ভাবে।

রাধানাথ, তুতুড়ি, রামেন, কার্তিক, অতুল, সুকু, নিকুঞ্জ, হারানিধি প্রভৃতি সাদামাটা চরিত্রগুলিকে বড়ো বেশি চেনা চেনা লাগে। মনে হয়, এরা আমাদের দেখা কেউ। বড় কাছের। মনে হয়, কাছে যাই, মাদুর পেতে বসি, দুটো গল্পগুজব করি। নদীমাতৃক বাংলা মানে তো আসলে এরাই। আমরাও যেন কোথাও মিশে আছি এদের মধ্যে। আমরাই হয়তো কেউ কেউ এক-একজন অতুল, রামেন, নিকুঞ্জ! এদের দেখা মানে যেন একা একা আয়নার সামনে দাঁড়ানো। এঁদের জীবনযাপন যেন আসলে আমাদেরই। হয় আমার, নয় আমার চেনা কারও। ফলে চরিত্রগুলোর সঙ্গে সহজেই মিশে যাওয়া যায়। সেই যে, নদীর মতো, সুখে সুখী, দুখে দুখী। আমরাও তো নদী। এক-একজন এক-একটা নদী। প্রবাহমান। আমরাও তাই সুখে সুখী, দুখে দুখী। হাসি দেখে হাসি, কান্নায় আষাঢ়-শ্রাবণ। আমরাই কেউ আলো-কালো! এ তো বড়ো বেশি আমার, আমাদেরই কথা।

ঘন বাদলধারার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। বর্ষা, তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের। কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি মুছে দিয়েছে তীব্র শুষ্ক ভাব। 'আকাশময় গাভিন মেঘের নধর চলাফেরা। ধনী-দরিদ্র সকল কৃষকের মুখে খুশির দীপাবলী।' এমন বাক্যে চোখ রাখলে মনের দহন দূর হয়ে যায়। ঠিক এর পরেই দেখি 'এ বর্ষণের জলেই হবে জমির সাজ-সজ্জা।' আহা! 'জমির সাজ-সজ্জা'—সাধারণ, অথচ কী পবিত্র শৈল্পিক উচ্চারণ। বহু জায়গায় লেখক এমন টুকরো টুকরো শিল্পসম্ভার যত্ন করে বুনে দিয়েছেন। যা আমাদের চমকে দেয়। ভাবায়। আমরা পাঠ করতে করতে আহ্লাদিত হই। এই আহ্লাদ গোপন আহ্লাদ। দলের নয়, একার। যে বোঝে, সে-ই বোঝে।

ঋতুবৈচিত্র অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কখনও তা বর্ণনায়, কখনও সংলাপে। পড়তে পড়তে আমরা গরমে দরদর ঘামি, বৃষ্টিতে ভিজি, শীতে হিহি কাঁপি।

নদীভেজা একটি বিশেষ অঞ্চলের কথা উঠে এসেছে এই লেখায়। ফলে আঞ্চলিক ভাষাও ঢুকে পড়েছে হুহু করে- 'কুশল জানতে চায়- হাঁ বারে সরকারের ব্যাটা, বাড়ির সগায় ভাল ত! অ্যাত্তো সকালে কুনঠে যাচ্ছেন? অতুল চলার মধ্যেই জবাব দেয়- কোবরাজের বাড়ি।

- কার কী হলি রে বা!
- মোর বেটি কুনার।'

তবে যাঁরা সেই ভাষা জানেন না, তাঁদের খুব বেশি হোঁচট খেতে হবে না। পড়তে পড়তে, গল্পের টান কখন যে আপনাকে শেষ পাতায় দাঁড় করিয়ে দেবে, আপনি বুঝতেও পারবেন না!

এই উপন্যাসে আমরা পেলাম উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের আত্রাই নদী তীরবর্তী অঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা। তাদের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন কাহিনিকার। এই নদী তাদের বড় আপনার। সুখে সুখী, দুখে দুখী। আনন্দে সে খলবল করে ওঠে, শোকে উন্মাদ! সেই নদী অফুরান স্নেহ দিয়ে আগলে রাখে মানুষগুলোকে। আর, কী করে ভুলি, মানুষও বহুকাল ধরেই নদীকে মাতৃরূপে পুজো করে এসেছে

সাদামাটা চরিত্রগুলিকে বড়ো বেশি চেনা চেনা লাগে। মনে হয়, এরা আমাদের দেখা কেউ। বড় কাছের। মনে হয়, কাছে যাই, মাদুর পেতে বসি, দুটো গল্পগুজব করি। নদীমাতৃক বাংলা মানে তো আসলে এরাই। আমরাও যেন কোথাও মিশে আছি এদের মধ্যে। আমরাই হয়তো কেউ কেউ এক-একজন অতুল, রামেন, নিকুঞ্জ! এদের দেখা মানে যেন একা একা আয়নার সামনে দাঁড়ানো। এঁদের জীবনযাপন যেন আসলে আমাদেরই

প্রত্নজীবন ঃ কবি চক্রবর্তী। দধীচি। ২০০ টাকা